আন্দামানের ধর্ম,...

দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

আন্দামানের ধর্ম, ভাষাগত সমাজ এবং বাঙালি

আন্দামান কলকাতা থেকে আকাশ পথে ১৩০০ কিলোমিটারের সামান্য বেশি দূরে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব দিকে। উত্তর - দক্ষিণে বিস্তৃত ৬,৪০০ বর্গ কিলোমিটার অ য়তনের এই ধনুরাকৃতি দ্বীপ পুঞ্জের ৫৪০ টির মধ্যে ২৮ টিতে মানুষ বাস করে। জনসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। দ্বীপপুঞ্জের ৯২ শতাংশ অরণ্যাবৃত। পূর্বে আন্দামান উপস াগর, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে নিকোবর- কে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ভীষণ ভয়ঙ্কর ১০০ প্রণালী। এমনই এক পরিবেশে আন্দামান, নামকরণে পুরাণের ছোঁয়া, প্রাচীনতম জনগোষ্ঠিপ্রস্তর যুগের, এবং ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সুপ্রাচীন। আন্দামানের জলজঙ্গল ভারতমাতার চরণে সবুজ সোনায় গিল্টি- করা মরকত নূপুরের রহস্য নিক্কণ।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের যে সব জায়গায় জনবসতি আছে তারমধ্যে অ্যাবারডিন বাজার, জংলিঘাট, রাধানগর, নীলদ্বীপ, রঙ্গত, ফারাগঞ্জ, মায়াপুর এবং ডিগলিপুর উল্লেখযোগ্য। যাঁরা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁরা সেখানেই আছেন সেখানে তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু অধ্যুষিত রঙ্গদ, ডিগলিপুর ওরাধানগরে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান মানুষেরা প্রাচীন ও ধর্মীয় ভাবধারা এখনও বহন করে চলেছেন। কিন্তু যাঁরা পোর্টব্লেয়ার সহ অন্যান্য গঞ্জ এলাকায় জীবন ধারণের জন্য নানা কাজকর্ম করেন এবং বসবাস করেন, যাঁরা 'লোকাল' নামে পরিচিত, তাঁরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ।

এই গরিষ্ঠঅংশ সৃষ্টির মূলে রয়েছে একটা শিকড় - ছেঁড়া ইতিহাস। সিপাই বিদ্রোহ, মপ্‌লা (মালাবার উপকূলের) বিদ্রোহ, স্বদেশি আন্দোলন, ওয়াহাবি আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ১৮৫৮ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত অখণ্ড ভারতবর্ষের সাজাপ্রাপ্ত নির্বাসিত বিদ্রোহী, বিপ্লবী ও আন্দোলনকারীদের শাস্তিমূলক বন্দিশিবির ছিল এই অ ন্দামান। হাজার হাজার বিদ্রোহীকে তাঁদের আপন ভূমি ও সমাজ থেকে ছিন্ন করে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। এমন কী বিরাট সংখ্যায় 'ভাতু' (উত্তর প্রদেশের উপজাতি) সহ ফৌজদারি মামলার আসামিদেরও এখানে পাঠানো হয়। শাস্তির মেয়াদ শেষে অনেক বন্দি এখানেই থেকে গেছে, সংসার পেতেছে। তাদের বংশধরেরা ১৯৫৯ থেকে ১৯৭১ এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এবং ডিগলিপুর, হ্যাভ্‌লক (রাধানগর), হাট বে-তে পুনর্বসতি পাওয়া উদ্বাস্তুদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের; তামিলনাড়ু, রাঁচি, বর্মা, শ্রীলঙ্কা থেকে আসা শরণার্থীরা এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তৈরি করেছে। এদের দেশ বা প্রদেশ ভিন্ন, জেলা ভিন্ন, ধর্ম - সংস্কৃতি ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন। কিন্তু এদের বিগত দেড়শ'বছরের ইতিহাস প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ বাঁচার ইতিহাস। যারা স্রেফ ব্যবসা করতে এসেছিল তাদেরও প্রধান তা গিদ ছিল বাঁচবার। এই বাঁচার তাগিদ তাদের মূল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তৈরি হয়েছে এক মিশ্র জীবন ধারা। বঙ্গোপসাগর, আরব সাগরের তীরের মানুষ এখন আর বাঙালি, তামিল, মালায়ালি, তেলেঙ্গি বা বিহারি নয়, নয় হিন্দু, মুসলিম, শিখ বা খ্রিষ্টান। তারা এখন আন্দ ামানি 'লোকাল'। ভাষা তাদের মিশ্র হিন্দি (প্রশাসনিক ভাষার আধিপত্যে), লেখা রোমান হিন্দুস্তানি, ধর্ম জীবন ও জীবিকা কেন্দ্রিক। সর্বধর্ম সমন্বয় এবং জাতীয় সংহতির এক জীবনজোড়া নিদর্শন আন্দামন।

মূল ভূখণ্ডের সমাজ থেকে উৎপাটিত যে সব নিচু তলার কর্মচারি এবং নির্বাসিত কয়েদি এখানে থেকে গেছেন এবং মূল ভূখণ্ড থেকে স্ত্রী - পুত্র কন্যাদের এনে সংস ার করেছিলেন তাঁরা সবাই বিবাহ বন্ধনের ফলে মিলেমিশে গেছেন। মিশ্র সমাজের রীতিনীতিতে আপন সামাজিক ঐতিহ্য হারিয়ে গেছে। অনাথ আশ্রমের পারিবা রিক পরিচয়হীন ছেলেমেয়েরাও এখানে আশ্রয় নিয়েছে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের সন্তানেরাই 'লোকাল' নামেনতুন সামাজিক পরিচয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এমন কী উদ্বাস্তু শিবিরের মানুষেরাও মিশ্রণের মাধ্যমে আপন আপন প্রদেশ বা জেলার রীতিনীতি, অভ্যাস, ধর্ম ভাষা-র ইতিহাস হারিয়ে এক সংকর সম াজ গড়ে তুলেছে।

বিবাহের পরম্পরা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। প্রথম দিকে মেয়েরা সংখ্যায় কম থাকার জন্য বিবাহেচ্ছু পুষকে মেয়ের ধর্ম, মেয়ের ভাষাকেই গ্রহণ করতে হত। ধর্মান্তরকরণ সাধারণ ব্যাপার ছিল। কারণ ধর্মের ঐতিহ্যে যে সংস্কৃতি দৃঢ়মূল হয় সে সংস্কৃতি থেকে উৎপাটিত এবং বহুযোজন দূরে নির্বাসিত ছিল এই সব দ্বীপবাসী। তারা মাতৃভ াষাওহারিয়ে ফেলেছে। প্রাক্ ১৯৪২-এ এখানকার মানুষের প্রধান ভাষা ছিল হিন্দি, বাঙ্‌লা ও তামিল। দেশ ভাগের পর বাঙালির সংখ্যা সর্বাধিক হওয়া সত্ত্বেও ভ াষা গৌণ। কারণ, যে সব বাঙালি উদ্বাস্তু এখানে পুনর্বাসন পেয়েছিল তাদের ছেষট্টি শতাংশ ছিল প্রায় নিরক্ষর নমঃশূদ্র সমাজের। বাঙালা ভাষাকে আঁকড়ে না থেকে তাদের সন্তান সন্ততিরাজীবন ধারণের পিচ্ছিল পথে প্রশাসনিক ভাষাকে মনোবাক্যে গ্রহণ না করে পারেনি। তাছাড়া, বাঙালি শোণিত মজ্জায় রক্ষণশীল নয়। যেমনটি তালিম ভাষীরা, যেমনটি হিন্দি-ভাষীরা। তাই তাদের তাদের ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে,যদিও সার্বিক জীবনে ব্যাপকভাবে মিশ্র হিন্দি ব্যবহার করেছে। নতুন মাটিতে নতুনভাবে শিকড় বিছিয়ে ভিন্ন এক সমাজ - মানসিকতার মধ্যে এখানে সবাই সব হারিয়ে সবাই এক হয়েছে।

দেশ ভাগের পর যে সব বাঙালি এখানে পুনর্বাসন পেয়েছিল তাদের পদবি অনুসন্ধানে দেখা যায় অনেক বাঙালি পরিবার যে পদবি ব্যবহার করেছে, আসলে সে পরিবার সেই সম্প্রদায় বা সেই বর্ণের লোক নয়। সীমান্তে শরণার্থী শিবিরের ডামাডোলে অনেক বাঙালি পরিবার তাদের বৃত্তিগত পরিচয়ের পদবি পরিবর্তন ক'রে 'জাতে' উঠেছে। বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এমন আপন দুই ভাইয়ের পরিবারের পদবি ভিন্ন হয়ে গেছে শুধু তাই নয়, বর্ণ পর্যন্ত বদলে গেছে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন নিরক্ষর এবং দাঙ্গায় ভয়ার্ত পলায়মান শরণার্থীদের পদবি অনেক সময় সীমান্তের সরকারি কর্মচারিরাই ইচ্ছে মতো বসিয়ে দিয়েছে। দাঙ্গ ার মৃত ভাইএর স্ত্রীকে সীমান্ত পার হওয়ার সময় অন্য ভাইয়ের স্ত্রী হিসাবে রেকর্ড করতে হয়েছে এবং স্বামী স্ত্রী হিসাবেই শিবিরে বসবাস করতে হয়েছে। এমনি ভ

াবেই গড়ে উঠেছে নতুন যায়গায় নতুন পরিবার, নতুন পরিচয়। তাই বিচিত্র এই দ্বীপ-সমাজে নানা ভাষা জাতি বর্ণ সম্প্রদায়ের সামাজিক ব্যাখ্যা সরল রেখা টেনে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। হয়তো নতুন সভ্যতায় তার প্রয়োজনও নেই।

হাজার বছরের রক্ষণশীলতা, সামাজিক অনুশাসন যা দেশ ভাগের কুঠারাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল, সুদূর দ্বীপময় আন্দামানের লোনা জলে তা ভেসে গেছে। খুঁজে নিয়েছে নতুন করে বেঁচে থাকার নতুন মাটি, জল, বাতাস আর পরিবেশ, অসহায় সর্বস্বান্ত শরণার্থী যখন সরকারি সেবায় নতুন বসতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছে তখন ভেসে - যাওয়া - মানুষের মতো যাকে পাশে পেয়েছে তাকেই আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। জীবনের উজান টানে কে, কেন, কোথায় --- এ সব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গেছে। একই ব্যথায় ব্যথিত নানা স্থানের, নানা বর্ণের, নানা ভাষাশৈলীর মানুষ আত্মিক টানে আত্মীয় হয়ে উঠেছে--- যা কিনা রক্তের টানের চাইতেও বেশি সাহায্যকারী। নতুন প্রজন্ম আন্দামানের সূত্রে যেমন এক সংকর সমাজের সৃষ্টি করেছে, তেমনি স্বাভাবিকভাবে হারিয়ে ফেলেছে তার শিকড়ের ঠিকানা।

সময়ের ও পরিস্থিতি - পরিবেশের চাহিদা ভিন্ন। সামান্য জাতপাত, ধর্ম, প্রাদেশিকভাষা ভেদাভেদের অভিমানী দেওয়াল ভাঙতে সু করেছে কবে থেকেই। এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। অ্যাবারডিন বাজারে স্টুডিয়োর মালয়ালি মেয়েটি ইংরেজি জানলেও আমার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলল, জংলিঘাটের তামিল মালিকের হোটেলের একমাত্রবাঙালি মেদিনীপুরের ছেলেটি আমাকে বাঙালি জেনেও অনর্গল হিন্দিতে কথা বলতে থাকল আমার সঙ্গে; রাধানগরের হোটেলে রানাঘাটের বৈশ্য মানুষটির সহধর্মিণী বরিশালের নমঃশূদ্রঃ রঙ্গতের মুসলিম হোটেল মালিকটির বউ সাহা - পরিবারের, হোটেলে টাঙানো মসজিদ আর রাধাকৃষ্ণের ছবি পাশাপাশি; বাট - দ্বীপের অদূরে স্টেশনারি দোকানের মালিক উত্তর ২৪ পরগণার কুলতলীর বিপত্নীক সহদেব পালের স্ত্রী আমিনা। এখানেই শেষ নয়। শহরে শিক্ষা নিতে আসা গ্রামের বাঙালি ছেলেমেয়েরা অন্যভাষাভাষি ও সমাজের সঙ্গে অবাধে মিলে যাচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্কেরমাধ্যমে। বাঙালি ছেলেমেয়েরা যে সব পরিবারে বিবাহ করছে তাদের মধ্যে মোপ্লা, মুসলমান, তেলুগু, মালায়ালি,খ্রিস্টান এবং রাঁচির প্রবাসী হিন্দিভাষীরা আছে। এ সব ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় ভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়ে বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করে শাঁখা সিঁদুর পরছে, বাঙালি প্রথায় শাড়ি পরছে। শোনা গেল, শিক্ষিত বাঙালি ছেলে অন্য ভাষাও সম্প্রদায়ের মেয়েদের কাছে স্বামী হিসাবে বেশি আকর্ষণীয়। বাঙালি মেয়েরাও স্ত্রী হিসাবে ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিবারে বেশ মানিয়ে চলছে। এই নমনীয় সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাব সারা ভারতের মধ্যে আন্দামানকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আন্দামানের প্রায় প্রতিটি পরিবার অন্য পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; তা সে পরিবার হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান বা মালয়ালি, তেলুগু, বাঙালি যাই হোক না কেন।

সংস্কৃতি গড়ে ওঠে যে সামাজিক ঐতিহ্যে আন্দামানের সমাজ এখনো সেই ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এক্ষেত্রে সংস্কৃতির নিরিখটাও স্থির করা কঠিন কাজ। উদারপন্থী মুসলিমের উদ্যোগে হিন্দুর দেবদেবী পূজা, মন্দিরনির্মাণে অর্থদান, একই বাড়িতে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুগামী ভাইবোন থাকাটা আক্ষরিক অর্থে কোন্ সংস্কৃতির সংজ্ঞায় আসবে? পোর্ট ব্লেয়ারের আশে পাশে বহু বাঙালি আছে যাদের পদবিটাই শুধু ইঙ্গিত করে এদের পূর্ব পুষের পরিচয়। কিন্তু বর্তমানে তারা কোনো ভাবেই বাঙালি বলে মনে করতে পারছে না। ধর্মের পরিবর্তন, ভাষার পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক আত্মীয়তা গড়ে তোলা সবই বাঙালির সংস্কৃতির অস্তিত্বকে নষ্ট করে দিয়েছে। পূর্ব-পুষের বয়ে আনা রক্ষণশীলতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বসবাসের ফলে উদারতার অর্গলহীন ধারায় গলে গিয়ে তৈরি করেছে এক বর্ণময় সমাজ চিত্র। সংসাধিত সয়েছে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ।

বিশ্বের সর্বত্রই কমবেশি অভিবাসন (ইমিগ্রেসন) এবং প্রবাসন (এমিগ্রেসন) ঘটে থাকে। তার ফলেএক সংস্কৃতির রীতিনীতি, খাদ্যভ্যাস, পোশাকপরিচ্ছদ, ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গীর উপর অন্য সংস্কৃতির প্রভাব পড়েই। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আন্দামানের ক্ষেত্রে এটা প্রভাব নয়, সংমিশ্রণ। সংমিশ্রিত যে বর্ণময় সমাজ আস্তরণ (সেমাস্যাল মোজেইক) এখানে গড়ে উঠেছে তার পিছনে রয়েছে প্রয়োজন, পরিস্থিতি এবং প্রশাসনের অবিরাম অপ্রতিরোধ ক্রিয়াশীলতা। বাঙালির ঐতিহ্যগত শিথিলতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতা (ঘরে - বাইরে), সরকারি ভাষা হিসাবে হিন্দির দাপট এখানে বাঙলা ভাষাকে শীর্ণ করে তুলেছে। অথচ, আন্দামানবাসী তামিলরা সাংস্কৃতায়নের হাত থেকে সচেতনভাবে অনেকটাই মুক্ত থাকতে পেরেছে। শিক্ষকতার কাজে মূল ভূখণ্ডে থেকে যাওয়া অবিমিশ্র বাঙালি শিক্ষকেরা অবসর নেওয়ার পর সে সব যায়গায় মিশ্র বাঙালি বা অন্যভাষীরা কাজ করছে। বাঙলা আরো কোণঠাসা হয়ে গেছে। অতুল স্মৃতি সমিতি, নেতাজি ক্লাব, দ্বীপবাণী পত্রিকা বাঙালি সংস্কৃতির ধারক বাহক হলেও তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। পত্রিকা প্রকাশ, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, পাঠাগার পরিচালনা শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়েৰ মধ্যেই উৎসাহ এনেছে। জীবন জীবিকার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাঙালা ভাষা ও বাঙলি সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। রবীন্দ্র বাঙলা বিদ্যালয় একমাত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাঙলা বিদ্যালয়, দ্বীপবাণী একমাত্র বাঙলা পাক্ষিক। সারা আন্দামানে একটাও বাঙলা মুদ্রণ যন্ত্র নেই। কলকাতার উপর ভরসা।

ব্যাপক সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও সংমিশ্রণের ফলে একদিন বাঙলা ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি আন্দামন থেকে অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে এম আশঙ্কা করেছেন এখানকার সংস্কৃতিমনস্কৱা। বাঙালাভাষা ও সংস্কৃতির অহল্যাভূমি আন্দামান শিষ্ট সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পাশাপাশি অপেক্ষা করছে ব্যবহারিক বাঙালি ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারণের জন্য। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিমনস্ক সংবেদনশীন সরকার কি দু ঘন্টার আকাশ পথে বঙ্গ- দূতের ডানা মেলে গিয়ে সরল সবুজ প্রবাল পান্নার দেশে ব্যাপক ব্যবস্থার হলকর্ষণে বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির সোনার ফসল ফলিয়ে তাকে বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পারেন না?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com